https://www.prothomalo.com/opinion/article/1560305/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A4-%E0%A6%93

প্রথম আলো

শ্রম আইনে প্রস্তাবিত সংশোধনের আলোকে মতামত ও সুপারিশ

০৬ অক্টোবর ২০১৮, ১২:১১ আপডেট: ০৬ অক্টোবর ২০১৮, ১২:৪৯

প্রিন্ট সংস্করণ

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলোর আয়োজনে ও বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) সহযোগিতায় ‘শ্রম আইনে প্রস্তাবিত সংশোধনের আলোকে মতামত ও সুপারিশ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আলোচকদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে এই ক্রোড়পত্রে ছাপা হলো।

আলোচনায় সুপারিশ

- শ্রমসংক্রান্ত মামলার বিচারপ্রক্রিয়ায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
- ক্ষতিপূরণের বেলায় আইএলওর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে
- ট্রেড ইউনিয়নকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন
- আইনের মাধ্যমে শ্রমিকের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করা জরুরি

■ শ্রম আদালতে বিচারকার্য শেষ হওয়ার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে
■ যৌন হয়রানি বন্ধে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা প্রয়োজন
■ শ্রমিকের সুবিধার্থে শ্রমঘন এলাকায় শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার
■ কর্মক্ষেত্রে যেকোনো প্রকার হয়রানির জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান করা জরুরি
■ শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনা বিমার ব্যবস্থা করা যেতে পারে

আলোচনা- আব্দুল কাইয়ুম
সরকার শ্রম আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রস্তাবনায় শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জরিমানার ব্যবস্থা আছে। ১৪ বছরের নিচে যেকোনো বয়সী শিশুকে কাজে নিয়োগ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এসবই ভালো উদ্যোগ, তবে প্রস্তাবিত সংশোধনীর বেশ কিছু বিষয়ে আরও কাজ করার সুযোগ আছে। শ্রম আইনের কার্যকর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়, তা আজকের আলোচনার বিষয়। এখন এ বিষয়ে ব্লাস্টের পক্ষ থেকে আলোচনা করবেন মো. বরকত আলী।

মো. বরকত আলী

মো. বরকত আলী
সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদে পাস হওয়া শ্রম আইনের খসড়ায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। শ্রম ও শ্রমিকের সঙ্গে জড়িত চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্লাস্ট পরামর্শ প্রদান করেছে। এগুলো হলো শ্রমিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ, শ্রমবিষয়ক মামলা-মোকদ্দমার বিচারপ্রক্রিয়ায় এডিআরকে (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) অন্তর্ভুক্ত করা ও যৌন হয়রানি নিরসনের জন্য মহামান্য হাইকোর্টের যে রায় রয়েছে, তা শ্রম আইনে যুক্ত করা।

শ্রমিকের সংজ্ঞায় তদারকি কর্মকর্তাকে শ্রমিক হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে না। ২০১৩ সালে শ্রম আইন সংশোধনের আগে তদারকি কর্মকর্তাকে শ্রমিক হিসেবে গণ্য করা হতো। তদারকি কর্মকর্তার কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনিও একজন শ্রমিক।

ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে মৃত শ্রমিকের বেলায় ২ লাখ ও স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিকের জন্য ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর আগে ১ লাখ ও ১ লাখ ২৫ হাজার টাকার বিধান করা হয়েছিল। তবে আগে থেকেই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করে রাখা উচিত নয়। বরং ক্ষতিপূরণ বিবেচনা করার ক্ষেত্রে একটি ন্যূনতম মানদণ্ড থাকা উচিত। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন ১৮৫৫ সালের উচ্চ আদালতের বিভিন্ন নজির অনুসরণ করা যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় একজন শ্রমিকের মৃত্যুবরণে ২০ লাখ এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে ২৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উচিত। মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে অবসর ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধাগুলো বিবেচনা করা উচিত। অক্ষম শ্রমিকের ক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ বিবেচনায় থাকতে হবে।

আবার অস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ ও কাজ থেকে বিরত থাকা সময়ের সম্ভাব্য মজুরি বিবেচনা করা দরকার। মৃত বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের পরিবার থেকে একজন সদস্যকে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ দেওয়া। ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণভাবে না দেওয়া পর্যন্ত সর্বশেষ মজুরি প্রদান করতে হবে।
২০১৩ সালে রানা প্লাজা ঘটনার মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি আইএলও কনভেনশন ও পেইন অ্যান্ড সাফারিংয়ের বিষয়ে বিবেচনা করেছিলেন। যদিও রানা প্লাজা মামলা আজ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি। কিন্তু ইদানীং বেশ কিছু মামলায় দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তির আয়, দুর্ভোগ ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় রেখে মামলার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হচ্ছে।

সাংবাদিক মোজাম্মেল হকের মামলায় মহামান্য আপিল বিভাগ ১ কোটি ৭১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার রায় দিয়েছেন। শ্রম আদালতের সংখ্যার তুলনায় মামলার পরিমাণ অনেক বেশি। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ৭টি শ্রম আদালত ও ১টি আপিল ট্রাইব্যুনাল রয়েছে।
শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রম আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ায় ফৌজদারি কার্যবিধির সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি এবং দেওয়ানি কার্যবিধি প্রযোজ্য। বর্তমানে শ্রম আদালতে ১৭ হাজার ১২১টি মামলা চলমান। শ্রম আইনের ২১৪ ধারায় আরও একটি ধারা হিসেবে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তাহলে অনেক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।
কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধের জন্য মহামান্য হাইকোর্টের যে রায়, তা শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম হোসেন

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম হোসেন
বর্তমানে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসছে। এ জন্য আমাদের একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার। কারণ, মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হলে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ওপর নজর রাখা হবে। দেশের আইনকানুন কী পর্যায়ে রয়েছে, কেমন মানছি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হবে।
সমস্যা হলো, শ্রম আইন বলতে আমরা কেবল পোশাকশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধিনিষেধগুলো চিন্তা করি। এ মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। পোশাকশিল্পের বাইরেও শ্রমের বড় খাত রয়েছে। এগুলো আমাদের বিবেচনায় রাখা উচিত।

শিল্পশ্রমিকদের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সীরা হালকা কাজ করতে পারবে। কিন্তু দেখা যায়, তাদের দিয়ে একজন পরিণত শ্রমিকের কাজ করানো হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রশাসনের কড়া নজরদারি থাকা দরকার। তবে বর্তমানে শিশুশ্রমিকের বয়স ১২ থেকে ১৪ বছর করা হয়েছে। এটি একটি ভালো দিক।
ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ২০ লাখ টাকা প্রদান শারীরিক ও মানসিক ভোগান্তির বিষয়গুলো বিবেচনায় ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে একটা মানদণ্ড রয়েছে। শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনা বিমার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শ্রমিকদের মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে শ্রম আদালতকে আরও সক্রিয় হতে হবে। শ্রম আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। সময় নির্দিষ্ট করে দিলে বিচারপ্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। শ্রমঘন এলাকাগুলোতে আদালতের সংখ্যা বাড়ানো গেলে শ্রমিকের আদালতে আসতে সুবিধা হতো। অনেক সময় আদালতে আসার বিভিন্ন ভোগান্তির কথা চিন্তা করে অনেক শ্রমিক আইনের আশ্রয় গ্রহণে বিরত থাকেন।

কোনো কোনো সময় কাজের চাপ বৃদ্ধি করে দেওয়া হচ্ছে। এ জন্য যৌন হয়রানি ও অসদাচরণ—এই দুটি বিষয়কে আলাদা করে বিবেচনা করতে হবে।
প্রস্তাবিত সংশোধিত শ্রম আইন বাস্তবায়নের পর শ্রমের বিভিন্ন খাতের ওপর সমীক্ষা করে দেখা উচিত। এ আইন কার্যকরের ফলে কোন খাতে কী ধরনের পরিবর্তন হলো, কারও সমস্যা হচ্ছে কি না বা ইত্যাদি বিষয় সমীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

কামরুন নাহার

কামরুন নাহার
প্রস্তাবিত শ্রম আইনে ‘অশ্লীল’ ও ‘অভদ্রতাজনিত’ শব্দগুলো মুছে ফেলার অনুরোধ জানাচ্ছি।
কর্মক্ষেত্রকে পরিবেশবান্ধব ও নারীবান্ধব শব্দগুলো অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।
যৌন নির্যাতন বা হয়রানি প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা পরিষ্কার ও ব্যবহারোপযোগী। সেটা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তাহলে নারীদের বৈষম্য নিরসনে যারা কাজ করছে, সেটা সহজ হয়ে যাবে।
উন্নয়ন-সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ করা হয়। এটা নিন্দনীয়।
লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক সহিংসতা নিরসনে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সম্প্রতি সজাগ কোয়ালিশনের মাধ্যমে একটা কাজ শুরু করা হয়েছে, যেখানে ব্র্যাক, ব্লাস্ট, ক্রিস্টিয়ান এইড, এসএনভি এবং নারীপক্ষ একত্রে কাজ করছে। এর উদ্দেশ্য হলো সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক উভয়ের একটি উপায় বের করা।

এ ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের রায় একটি বড় সহায়। এর কার্যকর ব্যবহার করতে পারলে অনেক সমস্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসবে। এটা উন্নয়নকে গতিশীল করবে এবং উভয় পক্ষকে লাভবান করবে।

যদিও এটা নিয়ে আইন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আইনের খসড়া হয়েছে। এখান থেকে যে নির্দেশনা আসবে, তা দিয়ে কর্তৃপক্ষকে নিয়ে কাজ করার একটা ক্ষেত্র তৈরি হবে।
সম্প্রতি সজাগ কোয়ালিশনের উদ্যোগে একটা ভিত্তি জরিপ হয়েছে। সেখানে ৬৪ শতাংশ মানুষ বলেছেন, প্রতিরোধমূলক একটি আইনের কথা তাঁরা শুনেছেন। স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। এ জন্য আইনে এটা

অন্তর্ভুক্ত হলে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে, সব ক্ষেত্র নারীবান্ধব হবে। সামগ্রিক শ্রমিকদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং মালিকপক্ষ যথার্থ উপকৃত হবে।
সন্তানকে ডে-কেয়ার সেন্টারে রাখার ব্যবস্থা করা হলে মায়েরা কিছুটা হলেও কাজে মনোযোগ দিতে পারবেন।

ওয়াজেদুল ইসলাম খান

ওয়াজেদুল ইসলাম খান
তৈরি পোশাক বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানেও বিভিন্ন দিক দিয়ে সংকট রয়েছে। শ্রম আইন ও অন্য আইনগুলো মানা হচ্ছে না। আইন মানা হলে সংকট সৃষ্টি হতো না।
বাংলাদেশের শ্রম আইন যদি আইএলও কনভেনশন মেনে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন নিশ্চিত করত, তাহলে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের স্বার্থ রক্ষিত হতো। ইউনিয়ন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন এবারের সংশোধনীতে ৩০ শতাংশের পরিবর্তে ২০ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছে। এটা আইএলও কনভেনশন পরিপন্থী। কোনো ধরনের শতাংশ রাখা যাবে না। একসময় কোনো শতাংশ না থাকলেও কোনো কারখানায় তিনটা ইউনিয়নের বেশি ছিল না। শতাংশ করে নৈতিক অবস্থানকে জলাঞ্জলি দেওয়া ঠিক নয়। এটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

শ্রম আইন আইএলওর চেতনাবিরোধী হলেও কোনো বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়েছে। এটা ভালো দিক। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন করতে না দিলে মধ্যস্থতা করবে কে? ৪ হাজার পোশাক কারখানার ৭০০ ট্রেড ইউনিয়নের বেশির ভাগই নিষ্ক্রিয়। একজন শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হলে মালিক তাঁকে চাকরিচ্যুত করেন। এ ক্ষেত্রে লেবার ডিপার্টমেন্ট ও কারখানা পরিদর্শকের ভূমিকা থাকতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইএলও কনভেনশনের পক্ষে ছিলেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রম আইন পরিবর্তন করার কথা উল্লেখ ছিল। ১০ বছর আগে প্রচলিত ক্ষতিপূরণ ১ লাখ টাকাকে বর্তমানে ২ লাখ টাকা করা হয়েছে। তবে মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি চিন্তা করলে এটা কোনো ক্ষতিপূরণই নয়।
ব্লাস্ট কর্তৃক ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে এটাও ঠিক নয়। ক্ষতিপূরণের বেলায় শ্রমিকের সঙ্গে মালিকেরও লাভ-ক্ষতির বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আর্থিক বিষয়টি নির্ধারণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে একজন শ্রমিক কত বছর সক্রিয়ভাবে শ্রম দিতে পারবেন, সেটা বিবেচনা করা উচিত। এতে জীবনের মূল্য দেওয়া না গেলেও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উচিত। ইপিজেডের জন্য আলাদা কোনো আইনের প্রয়োজন নেই। সারা দেশের সব শ্রমিকের বিষয় এ আইনের আওতায় বিবেচনা করতে হবে। বিভেদ করা উচিত হবে না। এক দেশের শ্রমিকের জন্য দুই ধরনের আইন তো হতে পারে না।

শ্রমঘণ্টার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী আট ঘণ্টাকে অপরিবর্তিত রাখতে হবে। কিশোরদের (১৪-১৮ বছর) দিয়ে হালকা কাজ করার পরিবর্তে ভারী কাজ করালে কী শাস্তি হবে, তা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ছয় মাস এবং বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে চার মাস। এ বৈষম্য না রাখাই ভালো। অসদাচরণের জন্য শ্রমিকের বকেয়া বেতন প্রদান করা হয় না এবং চাকরিচ্যুত করা হয়। এটা ঠিক নয়। অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। তবে বকেয়া বেতন দিতে হবে। তা ছাড়া মালিকের উচিত যখন-তখন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা থেকে বিরত থাকা।

হামিদা হোসেন

হামিদা হোসেন
শ্রম আইন সংশোধনের আলোচনা হচ্ছে। আইন সংশোধনের আগে সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা না করলে অনেক ত্রুটি থেকে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহল থেকে ত্রুটি থাকার অভিযোগ করা হয়েছে।একজন শ্রমিকের মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণ হিসেবে মাত্র ২ লাখ টাকা কোনোভাবেই হতে পারে না। ২ লাখ টাকা মানে তিন থেকে ছয় মাসের খরচ।
রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় একজন শ্রমিকের ক্ষতিপূরণে ২১ লাখ টাকা ধরা হয়েছিল। বর্তমান সংশোধনীতে এটা বিবেচনা করা উচিত। ক্ষমতাবানদের ভয়ে সবকিছু মেনে নিলে শ্রমিকেরা কোথায় যাবেন? এ জন্য আইনের সংশোধনে আইএলওর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা উচিত।

হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যৌন হয়রানির বিষয়ে প্রতিটি কারখানায় একটি করে কমিটি হবে। এ ধরনের কমিটি এখনো হয়নি। কারখানা কারা তত্ত্বাবধান করেন, আমরা জানি না। এগুলো সংশোধনীতে থাকা উচিত। মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাস থেকে ছয় মাস করা উচিত।

আবার নারী শ্রমিকের গর্ভধারণের কথা জানাজানি হলে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এ বিষয়গুলো আইনের আওতায় আনা উচিত। গৃহকর্মীদের বিষয়টি আইনে উল্লেখ করা হয়নি। অনানুষ্ঠানিক খাতে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের বিষয়গুলোও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এসব বিষয় সংশোধনীতে নেওয়া উচিত।

আবুল হোসাইন

আবুল হোসাইন
২০০৬ সালের আইন সংশোধন হতে হতে আজ এ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। তবে আইনটি সর্বজনীন করা প্রয়োজন। ‘আইনটি এদের জন্য প্রযোজ্য, এদের জন্য প্রযোজ্য নয়’—এটা কেমন কথা? এ আইন মাত্র ১০-১২ শতাংশ মানুষকে আইনি সুরক্ষা দেয়। তাহলে আইনটি কার জন্য করা হয়েছে?

তা ছাড়া এটি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে, সব নাগরিক ভয়হীনভাবে সংগঠন করার অধিকার রাখবেন। তাহলে অবাধ সংগঠন করা যাবে না, এমন আইন কেন? সংবিধানের পরিপন্থী কোনো আইন করা যাবে না। আইএলও কনভেনশনের ৮৭ নম্বরে অবাধ সংগঠন করার কথা বলা হয়েছে। এটি মানতে হবে।
অসদাচরণ তো মালিকেরাও করতে পারেন। তার জন্য আইনি বিধান নেই কেন? সংশোধনীর ক্ষেত্রে এসব বিষয় বিবেচনা করা দরকার। কেবল শ্রমিকের পক্ষে আইন করার প্রয়োজন নেই। তবে এমন আইন করতে হবে, যেন মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষিত হয়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং শান্তি বজায় থাকে। যেখানে মালিকও জয়লাভ করবেন, শ্রমিকও সন্তুষ্ট থাকবেন।
সরকার কর্তৃক একজন হেলপারের বেতন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে মালিকেরা হেলপার রাখতে চান না। এই অনিয়ম কেন? এগুলো বন্ধ করার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।

মো. ইসরাফিল আলম

মো. ইসরাফিল আলম
আমরা বর্তমানে এমন একটা পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে আইন সংশোধনের বিষয়ে কোনো কিছু বলা ঝুঁকিপূর্ণ। তবে শ্রম প্রতিমন্ত্রী প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন, যা প্রশংসনীয়।
প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন পরিবর্তন করা হয়। ২০১৩ সালে শ্রম আইনে বিশাল

সংশোধনী আনা হয়। যদিও দু-একটি জায়গায় মালিকপক্ষের চাপে আমাদের পেছনে আসতে হয়েছে।

যেকোনো প্রতিষ্ঠানে একটা ট্রেই ইউনিয়নই যথেষ্ট। তিনটা বা চারটা হয়ে গেলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ফলে শ্রমিকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন। আইনের মধ্যে শতাংশ বেঁধে দিয়ে ত্রুটি রাখার দরকার নেই। মন্ত্রী মহোদয় না চাইলে তিনটার বেশি ট্রেড ইউনিয়ন রাখার দরকার হবে না। এমনকি একটা ট্রেড ইউনিয়নও হতে পরে। এভাবে আইএলওর কাছেও প্রশংসিত হতে পারি।

সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে ছয় ও চার মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা একটি দৃশ্যমান বৈষম্য। এটি বন্ধ হওয়া দরকার। গর্ভবতী নারীর চাকরির নিশ্চয়তা থাকা উচিত। পোশাকশিল্পের পরিবেশ আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে। তবে এক রুমে পাঁচ-ছয়জন থাকা ও লাইন ধরে গোসল করা, রান্না করা—এগুলোর সমাধান করতে হবে।
আমরা ডরমিটরি করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু সেটা হয়নি। মাত্র ২ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। একজন মালিকও ঋণ গ্রহণ করতে আসেননি। সরকার পোশাকশিল্পে বিভিন্ন সহযোগিতা দেবে। সরকার চাইলে প্রতিটি পোশাকশিল্পে ডরমিটরি থাকা বাধ্যতামূলক করতে পারে।

সব আইনই ভালো, যদি কার্যকর করা হয়। সব আইনই খারাপ, যদি সেটা বাস্তবায়িত না হয়। আইন আছে, কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নে নির্বাচন নেই। গায়ের জোরে দুই-তিন মেয়াদে ক্ষমতা দখল করে রাখা হয়। ট্রেড ইউনিয়নের চর্চা বা নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন রাখার দরকার কী? এ জন্য আইনের বাস্তবায়ন দরকার।
ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ লাখ টাকা ধরা হয়েছে। তবে কেউ চাইলে আরও টাকা প্রদান করতে পারবে। যদি এর বেশি করা হয়, তাহলে ছোটখাটো কারখানার মালিকেরা নিরুৎসাহিত হতে পারেন। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি ঠিকই আছে।

ধর্মঘটের ব্যাপারে ২০৯, ২১০ ও ২১১ ধারা বাস্তবায়ন করা জরুরি। সড়ক পরিবহনশ্রমিকেরা বিনা কারণে ধর্মঘট আহ্বান করেন। এটা ঠিক নয়। ধর্মঘট ডাকার একটা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। সেটা অনুসরণ করতে হবে। অনেক শ্রমিকনেতা এসব নিয়মকানুন সম্পর্কে সচেতন নন।
ট্রেড ইউনিয়নকে সক্রিয় করতে হবে। মালিকের কথায় পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন কোনো কাজে আসতে পারে না। এটি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। তাহলে শ্রম আইনের সফলতা আসবে।

জরিমানার বিষয়টি আরও বাড়ানো উচিত। কারণ, দেখা যায়, একটি মামলা তিন-চার বছর ধরে চলার পর জরিমানা হয় মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। এটি অপরাধপ্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। এর সংশোধন করা উচিত।

বিচারপতি মো. নিজামুল হক

বিচারপতি মো. নিজামুল হক
ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। অতীতে বিভিন্ন সময় এবং ২০১৩ সালের সংশোধনীতে ব্লাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজকের গোলটেবিলে সরকারের দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি উপস্থিত রয়েছেন। তাঁরা শিশু ও শ্রমিকদের বিষয়গুলো বিবেচনা করলে সংশোধনীটি পূর্ণতা পাবে।

একজন শ্রমিকের মৃত্যুর পর ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ অনেক কম হয়ে যায়। তবে এটা সত্য যে ছোট কারখানার অনেক মালিকের পক্ষে ২ লাখ টাকা কঠিন হয়ে যাবে। তারপরও ২ লাখ টাকা খুবই কম। টাকার পরিমাণ আরও বাড়ানো উচিত। ব্লাস্ট ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব করেছে। এটা সন্তোষজনক হতে পারে।

কারখানাগুলোতে যৌন হয়রানি লেগেই থাকে। তবে এটা কমে এসেছে। আরও কমে আসুক, এটাই প্রত্যাশিত। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির স্পষ্ট সংজ্ঞা এবং এর শাস্তির বিধান রাখা দরকার। এতে কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাবে। শ্রমিকের শ্রমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এ ছাড়া শ্রমসংক্রান্ত মামলার বিচারপ্রক্রিয়ায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি যুক্ত করতে হবে।

মো. সামছুজ্জামান ভূঁইয়া

মো. সামছুজ্জামান ভূঁইয়া
২০০৬ সাল থেকে চারবার শ্রম আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে, যার বেশির ভাগ ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আইন একবার করার পর পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন আনা হয়। শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে আমাদের কোনো ক্ষমতাই নেই। তবে আমরা মামলা করতে পারি।

মামলায় জরিমানা অনাদায়ে জেল দেওয়ার বিষয় আছে। কিন্তু জরিমানার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন অর্থের পরিমাণ উল্লেখ নেই। ফলে মালিকেরা অল্প জরিমানা দিয়ে পার পেয়ে যান।
বাংলাদেশের শ্রম আইনে জরিমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ব্যবস্থা নেই। এ ব্যবস্থা থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু সমস্যার সমাধান হতো।

আমরা প্রথমে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি। পরে সমাধান না হলে মামলার আশ্রয় নিই। ঈদের সময় অনেক শ্রমিকের বকেয়া বেতন না দিয়ে মালিক পালিয়ে যান। এ ধরনের বিষয় সমাধান করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তখন আমরা বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর দ্বারস্থ হই। তারা এসব সমস্যা সমাধান করে।
আমাদের একটা আইন আছে, ধারা ১২৪(ক)। ছোট কারখানায় ব্যক্তিগতভাবে কোনো শ্রমিককে বেতন দিতে দেরি করলে ওই আইন প্রযোজ্য হবে। কিন্তু গণহারে সবার বেতন দিতে দেরি করলে এই আইন প্রযোজ্য হবে না। সংশোধনীতে এসব বিষয় আসা উচিত। ট্রেড ইউনিয়ন-সংক্রান্ত কোনো বিষয় আমাদের

এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না।

কিশোর শ্রমিককে দিয়ে ভারী কাজ করানো হলে এবং শাস্তির বিধান উল্লেখ না থাকলে ৩০৭ ধারা অনুযায়ী বিচার হবে। সেখানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানাও হতে পারে।
অসদাচরণের বিষয়টি কেবল শ্রমিকের বেলায় করা হয়েছে। তবে মালিকদের বিষয়ে ১৯৫ ধারাতে অসৎ শ্রম আচরণের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর মাধ্যমে মালিককে আদালতে সাজা দেওয়ার বিধান রয়েছে।

মো. মুজিবুল হক

মো. মুজিবুল হক
যেকোনো আইন চলমান। তবে সময়ের প্রয়োজনে আইনে সংশোধন বা পরিবর্তন আনা হয়। কাউকে বাধ্য করে নয়, বরং ঐকমত্যের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের জন্য দুই বছর ধরে কাজ করছি।
শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ৪৯টি বিষয়ে সংশোধন আনা হয়েছে, যার সব শ্রমিকের পক্ষে।

আইএলওর সহযোগিতায় গাজীপুরে হোস্টেল ভাড়া করে দুই দিন আলোচনা করেও একমতে পৌঁছাতে পারিনি। পরে ৯ সদস্যের কমিটি করে ৪৯টি বিষয়ে একমত হয়েছি।
দেশে ট্রেড ইউনিয়নের সুস্থ চর্চা নেই। ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা না থাকলে দেশে অনেক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠবে। কেউ কারও নেতৃত্ব মানতে চাইবে না এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

খুলনায় একটির বেশি ট্রেড ইউনিয়ন হয়নি। কারণ, সরকার অনুমতি দিচ্ছে না। তবে আবেদনপত্র আসছে। ঢাকা শহরে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল। সরকার কোন দিকে যাবে?
বর্তমানে বাংলাদেশে ৯ হাজার ৫০০ নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। পোশাক খাতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এ সংখ্যা ছিল মাত্র ১২০। অনেকে শুধু নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ইউরোপে ট্রেড ইউনিয়ন কারখানাভিত্তিক নয়। একেক খাতের জন্য একেকটি করে ট্রেড ইউনিয়ন চালু রয়েছে। সেটা চিন্তা করলে পোশাক খাতে একটি ও লেদারে একটি ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে। কিন্তু আমরা কি সে রকম সংস্কৃতি চালু করতে পারব?

মাতৃত্বকালীন ছুটি নেদারল্যান্ডসের মতো দেশে মাত্র তিন মাস। বাংলাদেশে ছয় মাস। কিন্তু দুই দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার মধ্যে কত পার্থক্য! বেসরকারি খাতে আগে মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা ছিল কিন্তু কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হতো না।
এবারের আইনে মায়ের সুবিধা অনুযায়ী চার মাসের ছুটিসহ বেতন প্রদান করতে হবে। কোনো মালিক এটা করতে না চাইলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
কেন্দ্রীয় ফান্ড গঠন করার ফলে ইনস্যুরেন্সের টাকা শ্রমিকেরা এখন দাবি করা মাত্র পেয়ে যান। বিভিন্ন উন্নয়ন-সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে ফান্ড নিয়ে আসে। সেটা কোন খাতে ব্যয় করা হচ্ছে, তা

সরকারকে অবগত করতে হবে।

শ্রম আদালতের রায় ৬০ দিনের মধ্যে দিতে হবে। না হলে আরও ৬০ দিন আদালত ব্যয় করতে পারবেন। তা-ও না হলে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে ৬০-৯০ দিন সময় নিতে পারবেন। এর মধ্যে মামলার রায় দিতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন করা হচ্ছে।
ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পরিষদও আইনে আনা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে একজন শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ২০ লাখ টাকা বাস্তবসম্মত নয়। আমরা শতভাগ বাড়িয়ে ১ লাখ থেকে ২ লাখে উন্নীত করেছি। কেন্দ্রীয় ফান্ড থেকে ৩ লাখ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উৎসব ভাতা প্রদানের আইন করা হয়েছে, যা মূল বেতনের সমান হবে।

শ্রমিকদের সুবিধার্থে ঢাকার নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে আবাসিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় ১০০ বেডের পেশাগত রোগের জন্য ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের রায় শ্রম আইনে না আনলেও হবে। তবে বিধিতে আনা যেতে পারে।

আব্দুল কাইয়ুম
শ্রমিক আন্দোলনের হয়তো দুর্বলতা আছে, কিন্তু শ্রমিকেরা যে অনেক সময় বিভিন্ন কারখানায় কম মজুরি ও প্রতিকূল শর্তে কাজ করতে বাধ্য হন, সেটাও সত্য।
আলোচনায় এসব বিষয়ে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সংশোধনের পরামর্শ এসেছে। কর্তৃপক্ষ এসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে বলে আশা করি। আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য প্রথম আলোর পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

যাঁরা অংশ নিলেন
মো. মুজিবুল হক, এমপি: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বিচারপতি মো. নিজামুল হক: প্রধান আইন উপদেষ্টা, ব্লাস্ট, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, আপিল বিভাগ, সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশ
মো. ইসরাফিল আলম: সাংসদ, সদস্য, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মো. সামছুজ্জামান ভূঁইয়া: মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম হোসেন: পরিচালক. গবেষণা, সিপিডি
কামরুন নাহার: সদস্য, নারীপক্ষ
হামিদা হোসেন: আহ্বায়ক, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম
মো. বরকত আলী: উপপরিচালক, আইন, ব্লাস্ট
ওয়াজেদুল ইসলাম খান: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
আবুল হোসাইন: সভাপতি, টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

সঞ্চালক
আব্দুল কাইয়ুম: সহযোগী সম্পাদক, প্রথম আলো